সুপ্রভা চৌধুরীকে লেখা সাতখানি পূর্ণপত্র

(১)

বারাকপুর,

৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার

কল্যাণীয়াসু,

তুমি কোথায় এখন আছ জানিনে, মিরাশীর ঠিকানায় পত্রদিলাম। আগে তোমায় একখানা চিঠি দিয়েছি আজ ১৫/১৬দিনহল। তার মধ্যে অবিনাশ গাঙ্গুলির বই-এর থেকে গৈরীশীছন্দের একটা বড় নোট ছিল। তুমি সে চিঠিখানা পেয়েছ কিনাজানি নে, আমি ১৭ই ডিসেম্বর এখানে এসেছি। কলকাতায় আশা করেছিলাম তোমার চিঠি পাবো। এখানে এই অপূর্ব শীতের প্রকৃতির মধ্যে নির্জনে তোমার একখানা চিঠি পেলে বড় আনন্দ পেতাম, কিন্তু তা পাবার আশা নেই—কারণ আমি এখানে আর বেশিদিন থাকবো না। কোথায় যাবো তারও ঠিকনেই। পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে নিমন্ত্রণ আছে২৮/২৯শে ডিসেম্বর, সেখানেও যেতে পারি, রাঁচীতে আমারএক বন্ধু যাবার জন্যে অনুরোধ করেচেন, সেখানেও যেতেপারি, ফিরবার পথে গালুডিতে নীরদবাবুরা গিয়েচেন, সেজায়গা হয়ে আসতে পারি। তুমি চিঠি দিতে যে কেন এত দেরীকরো তা কে বলবে ?

এবার এখানে আমি একা। আমাদের পাড়ায় খুকু নেই, পাঁচীরা কেউ নেই, আছে কেবল ন'দি। খুব নির্জন পাড়া, বনেরমধ্যে একা একা থাকতে বেশ লাগে। পাঁচীদের বাড়ির চাবিটারেখে গিয়েচে আমি আসবো বলে। আমি ওদের ঘর খুলে একা সংসার করচি। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, কখনো করিনি, বেশলাগচে। আমার দৈনন্দিন কার্য-তালিকা থেকে বুঝতে পারবেআমার নতুন জীবন।

ভোর ছ'টায় উঠে নদীর ধারের পথে ও ধারে বেড়াই।হরি খুড়োর খেজুরবাগান থেকে একটু খেজুর রস আনি।

সাড়ে ছ'টায় ফিরে উনুন ধরাই। চা ও হালুয়া করি। ঘর ঝাঁটদিই। বিছানা রৌদ্রে দিই। সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত লিখি।

তারপর বাঁশবন থেকে শুকনো কঞ্চি, কাঠ, বাঁশের খোলানিয়ে এসে জড়ো করি, কঞ্চি কাটি, কাঠ কাটি, স্নান করে আসি ও এক বালতি নদীর জল আনি।

উনুন ধরিয়ে ভাত চড়াই। আলু, মুগের ডাল, হাঁসের ডিম ভাতে দিই, বেগুন পোড়াই, আর কিছু রাঁধতে জানি নে।

ভাত নামিয়ে দুধ জ্বাল দিই। তারপর পাতা পেতে খেতেবসি। এই সব করতে বেলা দুটো বাজে।

একটু বিশ্রাম করি ও একটা ইংরিজি ও আমেরিকানছোটগল্পের বইয়ের একটা গল্প পড়ি। বেলা ৩টেয় উঠে বাসনমাজি সামনে খুকুদের ডোবায়। বেলা ৩ টে থেকে ৫টা পর্যন্তলিখি।

তারপর বেড়াতে বেরুই, কোনোদিন হানিডাঙ্গা বা গ্রামেরচাষিবাড়ি খাজনার তাগাদা করতে যাই। কেউ বিশেষ কিছু দেয়না। বলি, তোদের গাছে বেগুন অছে ?লাউ আছে ?পালংশাকআছে ?ঘরে ডিম আছে ?থাকে তো দে। যে যা দেয়, নিয়েআসি। সন্ধ্যা সাতটা।

বাড়ি ফিরে আলো জ্বালি। উনুন ধরাই। চা করি। চা খেয়েময়দা মাখি। পরটা ভাজি। আলুচচ্চড়ি করি। বেগুন পোড়াই।রান্না সেরে লিখতে বসি। রাত দশটা বাজে। উঠে আবার উনুনধরিয়ে ওবেলার দুধটা জ্বাল দিই ও খেতে বসি।

তারপর রাত ১১টাপর্যন্ত বই পড়ি। ঘুমুই।

এসবের মধ্যে একদিন আবার হরিপদ বাঁড়ুয্যের সঙ্গেরাত্রে কুঠীর মাঠে খরগোশ শিকার করতে গিয়েছিলাম।ঝোপের ধারে খরগোশ থাকে ঘাপটি মেরে। টর্চের আলোয়চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে আর নড়তে-চড়তে পারে না। তখন গুলিকরে মারতে হয়। সেদিন একটাও পাইনি।

তোমাদের কলেজের নিশ্চয়ই ছুটি হয়ে গিয়েচে এবংতুমি বোধ হয় মিরাশী গিয়েচ। তোমাদের দেশে শীতকালেকেমন শোভা হয় জানি নে, কিন্তু সুপ্রভা, এখানকার শীতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুমি দেখলে ভুলতে পারবে না। ইচ্ছে হয় তোমায় নিয়ে এসে দেখাই। যদি তুমি এখানে থাকতে ! মাঠে, বনে সর্বত্র ছোট এড়াঞ্চির ফুলের কি শোভাই হয়েচে—চেয়েদেখলে চোখ ফেরানো যায় না। চারিদিকের শান্ত, রমণীয়, নির্জন পল্লীপ্রকৃতি মনের মধ্যে এমন একটা ভাব এনে দেয়যা এক পেয়েছিলুম ইসমাইলপুরে, আর দিনকতক পেয়েছিলুমসিংভূমের পাহাড় ও বনে। আর কোথাও পাইনি।

সুপ্রভা, তুমি কি আমার চিঠি পাওনি ?তবে চিঠি দিলে নাকেন ?তোমার জন্যে আমার মন সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে। তুমিকলকাতায় আসবে বলে আশায় আশায় আছি। কি আনন্দই হবে তুমি এলে। এখানে এই নির্জনে বসে সকাল সন্ধেয় তোমার কথা মনে হয় সর্বদাই। কেবল মনে হয় সুপ্রভা যদি এখানে থাকতো ! সত্যি, তুমি যদি এখানে থাকতে, আমার সংসার করাদেখে না হেসে থাকতে পারতে না।

চিঠি আর এখন দিয়ো না। কোথায় কবে থাকি তার নেই ঠিক। ৩রা জানুয়ারি কলকাতায় ফিরবো যেখানে থাকি।ঐসময় চিঠি দিয়ো। যদি এর মধ্যে অর্থাৎ গত কদিনের মধ্যে কলকাতায় ঠিকানাতেও দিতে, রিডাইরেক্ট হয়ে চিঠি এখানেআসতো।

তোমার বাবার শরীর কেমন আছে ?তাঁকেও ও তোমার মাকে আমার নমস্কার দিয়ো। রেবা সেবা কোথায় ?যদি ওখানেথাকে, আর্শীবাদ জানিও।

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুপুরের পরে গ্রামের বাইরে নির্জন মাঠে একটা খেজুরগাছে ঠেস্ দিয়ে বসে এই চিঠি লিখচি। বেলা দুটো।দূরে দূরে চারিধারে ফুল ফুটে আছে, দূরের গাছের মাথায় কতকি পাখি ডাকচে। নীল আকাশের কোলে বনের মাথার ওপরসাদা সাদা লঘু মেঘখণ্ড উড়ে চলেচে। আজ গোপালনগরের হাট। বেলা বাড়লে হাটে গিয়ে চিঠিখানা ডাকে দেবো।

(২)

নাগপুর

Civil L

১২ই আশ্বিন, '৪০।

কল্যাণীয়াসু,

সুপ্রভা, তুমি চলে যাবার পর আমি একদিন তোমাদের হোস্টেলে গিয়ে শুনি তুমি হঠাৎ চলে গিয়েছ। কতকগুলোভালো slide তোমাকে দেখাবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলামওদিন—কাংড়া উপত্যকার কতকগুলো ফটো, স্টিরিওস্কোপেরমধ্যে দিয়ে দেখ্‌লে একেবারে বাস্তব বলে মনে হয়।ইউনিভার্সিটি বন্ধ হবার আগেই তুমি স্কুল পালানো মেয়েরমতো পালিয়ে গিয়েচ।

এবার নাগপুরে বেড়াতে এসেচি—এখান থেকে মোটরে জব্বলপুরে যাবো—পথে ঘন জঙ্গল ও পাহাড় পড়বে। জব্বলপুরে নর্মদার জলপ্রপাত ও মার্বেল পাহাড়দেখ্‌বো। নাগপুরে আস্‌বার পথে অতি গম্ভীরদর্শন জঙ্গলও পাহাড় পড়ে। ডোঙ্গরগড় ছাড়িয়েই রেলপথের দুধারে অদ্ভুত গড়নের পাহাড় ও বুনো বাঁশের বন, সঙ্গে সঙ্গে শাল, পলাশ, অন্যান্য অজানা গাছের বনও আছে। শরতের আকাশএধারে খুব নির্মল, বাংলাদেশের চেয়ে রোদ খোলে ভালো, আকাশের রংও বাংলাদেশের চেয়ে নীলতর। আর এত বিরাটসমতলভূমি আমি এর আগে কখনো দেখিচি বলে মনে হয় না—এক চক্রবালরেখা থেকে অন্য চক্রবালরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত, দিগন্তপ্রসারী ধূ ধূ এত বিরাট প্রান্তরের কল্পনা না চোখে দেখলেমনে আনা কঠিন। দুঃখের বিষয় অপরাহ্নের ছায়ায় কিংবাজ্যোৎস্নারাতে এসব জায়গা দেখ্‌তে পেলাম না, নাগপুরেবেলা চারটের আগেই পৌঁছে গেলাম। এসবদিকের প্রান্তরমধ্যবর্তী ছায়াহীন জ্যোৎস্নারাত্রির রূপ মুখে বলে বোঝানোযায় না, তার বর্ণনা লেখাও যায় না, ইসমাইলপুরে খানিকটাএর আভাস পেয়েছিলাম, তা থেকেই বুঝতে পেরেচি এ আরো কত অপরূপ, কত অবাস্তব ধরনের সুন্দর হবে; পৃথিবীই নয়যেন, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো এক গ্রহলোক—এ কথাই মনেআসে, ইসমাইলপুরের অভিজ্ঞতা থেকে এ আমি জানি।

নাগপুরে মার্হাট্টী অধিবাসীদের সংখ্যাই বেশি। মেয়েদেরপরদা নেই, পথে রঙিন শাড়িপরা গৌরবর্ণ মার্হাট্টী মেয়েরা বাইকে চেপে স্কুল-কলেজে যাচ্চে—এদেশে পুজোর ছুটিনেই। স্কুল কলেজ আপিস আদালত সব খোলা। মার্হাট্টী মেয়েরা দেখতে বেশ সুশ্রী, বেশ একটা স্বাধীন, সতেজভাব, একা বাজার করচে, স্কুলে যাচ্চে, পার্কে বেড়াচ্চে, খুব ভালোলাগে।অধিকাংশ মেয়েকেই স্বাস্থ্যবতীও প্রফুল্লদেখচি—আবারকেমন অদ্ভুত, কলেজের অনেক মেয়ে খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে রঙ্গীন শাড়ি পরে সাইকেলে চেপে কলেজে চলেচে।আমাদের বাংলোর কাছেই ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংস ও সায়েন্সকলেজ, কত ছাত্রী এরকম অদ্ভুত সাজে দেখলাম। ভারী সুন্দরলাগলো, কিন্তু কলকাতায় এম.এ. ক্লাসের কোনো ছাত্রী যদি এসাজে ক্লাসে যায় ?

আজ এইমাত্র শহর থেকে দূরে একটা পাহাড়ের ওপরখুব বড় একটা হ্রদ মতো আছে, সেইটে দেখে ফিরচি। মোটরেঘণ্টা দুইয়ের পথ যেতে আস্‌তে। নাগপুর শহর সম্বন্ধে এরআগে কিছু কিছু পড়েছিলাম এবং আমার এক বন্ধু নাগপুরেঅনেকদিন ছিল তার মুখেও শুনেছিলাম—কিন্তু নাগপুর যেএমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় আবেষ্টনের মধ্যে—তা কারুরকাছে কোনোদিন শুনিনি। নাগপুর শহরের চারিধারে উঁচুমালভূমি ও পাহাড়—শুধু চারিধারে নয় যত দূর চোখ যায় তত দূর পর্যন্ত। অর্থাৎ শহরটা একটা ছোট উপত্যকার মাঝখানে।সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। অস্তদিগন্ত নানা রঙে রঙীন,বহু দূরে দূরে, উচ্চ মালভূমির সুদূর প্রান্তে সান্ধ্যছায়াচ্ছন্ন দিকচক্রবালরেখানীল শৈলমালায় সীমাবদ্ধ—সামনে, পিছনে, ডাইনেবাঁয়ে যে দিকে চাই, ধূ ধূ বৃক্ষহীন, বাধাহীন, অন্তহীন বন্ধুর মালভূমি, শৈলমালা, শিলাখণ্ড, দু-দশটা শাল পলাশ ও মেহগ্নিগাছ, মাথার ওপরে অপূর্ব আকাশ, পিছনের পাহাড়শ্রেনীগাড়ির বেগে ক্রমে দূরে গিয়ে পড়চে, সামনের হ্রদটা ক্রমেফুটে উঠচে, বাঁয়ে অনেক দূরে সীতাবল্‌দ্রির ফোর্ট (প্রাচীনদুর্গ, ভোসলাদের আমলে এখানে খুব বড় যুদ্ধ হয় ইংরেজদেরসঙ্গে) ও বেতার টেলিগ্রাফের মাস্তুল দেখা যাচ্চে—এমন একটামহিমময় দৃশ্যের সম্মুখীন হওয়া জীবনে যখন তখন ঘটে না।আনন্দের একটুখানি ব্যাঘাত হয়েছিল এইজন্যে যে আমাদেরসঙ্গে একজন যোধপুরী ছাত্র ছিল, সে অনবরত বক্‌বক্‌ করেবক্‌ছিল। বেচারির একটা ভুল ধারণা হয়েছিল যে আমাদের সঙ্গে অনবরত কথা না বল্লে তার দিক থেকে ঠিক আতিথেয়তা ও ভদ্রতা দেখানো হবে না।

কাল সকালে রামটেক্ যাবো—অনেকে বলেন এইরামটেকই কালিদাসের নির্বাসিত যক্ষের সেই রামগিরি। শুনেচি রামটেকে যাওয়ার পথটি নাকি অপূর্ব শোভাময়। যদি কাল আকাশে মেঘ না হয়, তবে তো বাঁচি, কারণ আজ এখন একটুযেন মেঘ-মেঘ করচে।

ক্র্যাড্ক টাউনে প্রবাসী বাঙালিরা দুর্গাপূজা করে, ফিরবার পথে দেখে এলাম। পাশেই একটা স্বদেশী প্রদর্শনীখুলেচে—তবে এসব জিনিস এখানে কল্কাতার তুলনায় কিছুই নয়। একটা খুব বড় জীবন্ত পাহাড়ি অজগর এনেচে, সেটাই দেখবার জিনিস একমাত্র।

তুমি বিজয়ার আশীর্বাদ নিয়ো। অন্যান্য সবাইকে নমস্কারজানিয়ো। পত্রের উত্তর দিয়ো নীচের ঠিকানায়। আমি না থাক্লে কল্কাতার ঠিকানায় চিঠিপত্র সব গোলমাল হয়ে যায়।

আঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুনঃ—এখন কি ভাবচি জানো ?বাংলাদেশও দেখতেসুন্দর বটে কিন্তু তার মধ্যে বিরাটতা, মহনীয়তা নেই। ব্যাসবাল্মিকীর (Sic) সঙ্গে চণ্ডীদাসের যা তফাৎ। Poetry of life বাংলাদেশের ভূমিশ্রীর সঙ্গে মিশে আছে। এখানে আছে। immensity, majesty—অবশ্য স্বীকার করি বাংলার মাঠেনদীর ধারে প্রকৃতি মুক্তরূপা, যেমনি লীলাময়ী, তেমনি রূপসী, সেখানেও মেঘ-চাপা গোধূলির আলো আছে—কিন্তু এখানকার immensity-র সঙ্গে তুলনা হয় না। একটা বাল্মিকীর (Sic) অরণ্যকাণ্ডের বন বর্ণনা আর একটা বৈষ্ণবকবিদের বৃন্দাবনের নিকুঞ্জশোভার লিরিক কবিতা।

(৩)

কলিকাতা

৬ই কার্তিক, ১৩৩৯

কল্যাণীয়াসু,

সুপ্রভা, তোমার পত্র এবার ঠিক সময়েই পেয়েছি। আমারএলাহাবাদ যাওয়া ঘটে ওঠে নি, কল্কাতায় আমার একটিআত্মীয়ার অসুখের জন্যে এখানেই থাক্তে হয়েচে। আরএদিকে ছুটিও শেষ হয়ে এল; আর যে কোথাও যাওয়া হবে, এমন গতিক দেখি নে।

তোমার পত্র পেয়ে ভারি খুশি হয়েচি। আমার সন্দেহছিল পত্র তুমি পাবে কি না। 'মিরাশী কথাটা ভালো পড়তেপারিনি, একবার ভাবলাম হয়তো বা 'মিরানী' হবে। এইদ্বিধাগ্রস্ত অবস্থাতেই পত্র ডাকে ছেড়ে দিলাম, কেবল তোমারপত্র আসবার দু'একদিন আগে আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা, তার বাড়ি সিলেটে; তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে মিরাশী' বলে গ্রাম আছে সিলেটের হবিগঞ্জ সাব্ডিভিসানে এবং বেশবড় গ্রামই।

আমি রেঙ্গুনে ছিলাম কার কাছে শুনেছিলে ?রেঙ্গুনকোনোদিন চক্ষেও দেখিনি। টম্সন্ সাহেব যে নতুন বইখানালিখেচেন, 'Letters from India', তাতে বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গে আমার সম্বন্ধে কিছু কথা আছে। আমি নাকি আফ্রিকাপর্যন্ত বেড়িয়ে এসেচি এবং সেখানে কিছুদিন ছিলামও। এত বাজে গুজবও রটে ! তবে আফ্রিকা না গিয়ে আফ্রিকা ভ্রমণকারীর খ্যাতি অর্জন করা মন্দ নয়।

রেঙ্গুন বা আফ্রিকা না গেলেও এর মূলে খানিকটা সত্য এইআছে যেচাকুরি উপলক্ষে কয়েকবছর ধরে খুব বেড়িয়েছিলাম।পূর্ববঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা, আসামে ওদিকেতিনসুকিয়া পর্যন্ত, চাটগাঁ, রাঙ্গামাটি hill tracts ও আরাকানের আকিয়াব জেলারমংডু পর্যন্ত পূর্বে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়জঙ্গল অঞ্চলে নানা নির্জন ডাকবাংলোতে

অনেকদিন কাটিয়েচি। সে সব দিনের অভিজ্ঞতা এত বিচিত্র, এত অনন্যসাধারণ, চিরকালের জন্যেমনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে সে সব। মংডুতে স্থলপথে যাই arakan yoma পর্বতশ্রেণীর পথ দিয়ে; পাহাড়ের মাথা দিয়ে দিয়ে সরু trail, প্রায় ৬০ মাইলের মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন মেরামত করবার মিস্ত্রিদের জন্য গবর্নমেন্ট বাংলো ছাড়া অন্যঘর বাড়ি প্রায় নেই, সারা অঞ্চলটা বনে ভরা ও বসতিশূন্য।উপত্যকাগুলো দুষ্প্রবেশ্য ও শ্বাপদসঙ্কুল বলে পাহাড়ের ওপরছাড়া অন্য স্থানে পথ থাকা সম্ভব নয়। বিখ্যাত বৈমানিক Sir Ross Smith বলেছিলেন ইংলন্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া উড়েযাবার সময় তিনি কোনো জায়গাকে এত ভয় করেন নি, যতটা ভয় করেছিলেন arakan yoma-র এই বন্যপ্রদেশকে। কোনোরকম এঞ্জিনের গোলমালে যদি তাঁকে নামতে বাধ্য হতে হয়, তবে যে খাদ্যহীন, জনহীন অঞ্চলে মৃত্যু ছাড়া অন্য পন্থা নেই, এটা তিনি ভালোই বুঝেছিলেন।

কিন্তু কি অপূর্ব সুন্দর এই অরণ্যপ্রদেশ ! এই শরৎকালেইযেখানে গিয়েছিলাম, বর্ষাশেষে কত বিচিত্র বন্যপুষ্প, ডালেডালে কত ধরনের অর্কিড, ঝরণাগুলো তখনো বেগবতী, বন্যরসুন ও লিলিফুলে সানুদেশ আবৃত। রডোড্রেন্ডন ফুলের কিবিপুল সম্ভার। সেখানকার জ্যোৎস্নারাত্রির শোভা না দেখ্লেকল্পনা করা সম্ভব নয়—নিশীথে চাঁদের আলো পর্বতের চূড়ায়, ঝরণার জলে, অরণ্যানীর মাথায়, পুষ্পিত অর্কিডের থোকায় থোকায়, বিশাল বনস্পতিদের সারিতে—আর মাঝে মাঝেগিবনের ডাক কিংবা কোনো নৈশপাখির কুস্বর, সবসুদ্ধ মিলেঅপূর্ব গাম্ভীর্য। এখন শহরের কোলাহলের মধ্যে সে সব অস্পষ্টস্বপ্নের মতো মনে হয়। একদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে আমার এঅভিজ্ঞতার গল্প করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, যতই বলো ও বন মানুষের জন্য নয়, বাঘভালুকের জন্যে। আজ মনেহয় তিনি ঠিকই বলেছিলেন, বনানী আমাদের পছন্দ করে না, আমাদের তাড়িয়ে দেয়। মানুষের সঙ্গে ওরবুঝি শত্রুতা আছে, চায় না যে আমরা ওর রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করি।

থাক্, বনের কথা আর লিখ্বো না। আমার ওখানে একটুদুর্বলতা আছে, তবে তোমাকে লিখলাম এই জন্যে যে আমারমনে হয় তুমি এসব বুঝ্বে, তোমার হয়তো ভালো লাগ্বে, তোমান মন প্রকৃতিমুখী, বনের গল্পে বিরক্ত হবে না।

তোমার পত্রে তোমাদের বাড়ির লক্ষ্মীপুজো ও আল্পনার কথা আমার ভারি ভালো লেগেচে। তুমি কলেজে পড়েও যেবাংলাদেশের পল্লীউৎসবের সঙ্গে এমন যোগ রেখেচ, এতেবাস্তবিক বড় আনন্দ পেয়েচি। লক্ষ্মীপুজো আমি নিজে মানি না মানি কিন্তু মেয়েরা এই সব গ্রাম্য উৎসবের ধারা বজায় রাখে, এটা আমি মনেপ্রাণে চাই। বাংলাদেশের পল্লীসভ্যতারধাতুপ্রকৃতি এইসব অনাড়ম্বর সুন্দর, সরল পূজার্চনার মধ্যেদিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও কৃষ্টি অক্ষুণ্ন রেখে আস্চে আজ কতশত বৎসর, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও বৈষবকবিদের সময়থেকে রন্ধনশিল্প ও আল্পনা শিল্পের ধারা বজায় রেখেচে এবংবাংলার মেয়েরাই এর অনির্বাণ দীপ নিজেদের আঁচল দিয়েসযত্নে ঢেকে রেখে আস্চে কতদিন ধরে, নইলে ঝড়ঝাপ্টায়কোকালে নিবে যেতো।

এখানে দু'দিন ধরে ঝড় বৃষ্টি নেমেচে। তাতে দুঃখিত নই, ভাগ্যে দেশে থাকার সময় হয়নি। এখন এখানেই থাক্বো।বন্ধুবান্ধবেরা কেউ শিলং, কেউ গিরিডি, কালীপুজোর এদিকেফিরবে বলে মনে হয় না। আমি ভালোই আছি, আশা করিতোমাদের শারীরিক কুশল। স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনঃ আমার হাতের লেখা বড় খারাপ, সেবার চিঠি পড়তে কষ্ট হয় নি। এবার ফাউন্টেন পেনটা খারাপ হয়েযাওয়ায় লেখা অারো বিশ্রী হল।

ইছামতী বক্ষে

বারাকপুর থেকে বনগাঁ

৪ঠা বৈশাখ

কল্যাণীয়াসু,

সুপ্রভা, নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।আমি ইস্টারের ছুটিতে বারাকপুর এসেছি। এবার দেশে কি ভীষণ গরম ! অন্যবার জ্যৈষ্ঠ মাসেও এত গরম পড়ে কিনাসন্দেহ।এবার এখানে খুকুরা অছে বলে এতটা নিঃসঙ্গ বোধ হয়না। তবে এই ভীষণ গরমে এক বোঝা ম্যাট্রিকের কাগজ দেখারযে কি দুর্ভোগ, সেটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝানোশক্ত হবে। তুমি নিশ্চয় মিরাশীতে গিয়েছ, আমি কিন্তু এ পত্রশিলং-এর ঠিকানাতেই দিলাম—কারণ হিসেব করে দেখলাম এচিঠি পৌঁছুতে পৌঁছুতে তুমি শিলং এসে পড়বে।

তোমাকে এই চিঠি যখন লিখছি যখন বারাকপুর থেকেনৌকোতে বনগাঁয়ে যাচ্ছি। বেলা ৩টে হবে, জলের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা লাগচে বলে রোদের ঝাঁজে ততটা কষ্ট হচ্ছে না। নৌকো দুলচে বলে লেখা ঠিক সোজা হচ্ছে না। আজসকাল থেকে অনেকবার তোমার কথা মনে পড়েচে—আরো বিশেষ করে মনে পড়েচে এইজন্যে যে তোমাকে নববর্ষের চিঠি লিখবো বলে একজন আর্টিস্টকে একখানা কার্ড আঁকতেদিয়েছিলুম। কথা ছিল সে বারাকপুরের ঠিকানায় ১লাবৈশাখের মধ্যে সেখানে পাঠিয়ে দেবে—তারই জন্য অপেক্ষাকরলুম এ ক'দিন কিন্তু সে তো কার্ডখানা পাঠালে না। তারওপরে ভুল করেছি এখানে লেখার প্যাডটাও আনিনি—কিসেচিঠি লিখি ?অবশেষে ম্যাট্রিক পরীক্ষার খাতার একখানা কাগজ ছিঁড়ে চিঠি লিখছি। নদীর ওপরে নৌকোতে বসেতোমাকে চিঠি লিখতে বেশ লাগছে। দু পাড়ে বন আর মাঠ, মাঝে মাঝে ঝিঙের ক্ষেত, বাঁশঝাড়, প্রাচীন বটগাছ, কোকিল ডাকচে, বৌ-কথা-কও ডাকচে। এবার নৌকোখানা ঘাটবাঁওড়নামে একটা গ্রামের ঘাটের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, জনকয়েকচাষার মেয়ে জল নিতে এসেছে, একটা ছোটমেয়ে চুপড়িতেকরে কলমীশাক ধুচ্চে—এপারে একটা বটগাছের তলায়খানিকটা বন কেটে পরিষ্কার করে কারা একখানা নতুন খড়েছাওয়া চালাঘর তুলেচে। একটা চলতি নৌকো বারাকপুরেরদিকে যাচ্ছে, আমায় মাঝি জিজ্ঞেস কল্লে, বাবু, বাড়ি থেকে ফিরলেন নাকি ?বল্লাম হ্যাঁ। কত দূর যাবে ?বল্লে—এই ঘাটবাঁওড় পর্যন্ত, সওয়ারি আছে। একটা বড় বোঝাই নৌকোমন্থর গতিতে বনগাঁমুখে চলেচে। কোথাকার নৌকো বাপু ?বল্লে—দক্ষিণ। দক্ষিণ কোথায়?কি বোঝায় এতে ?উত্তর দিলে দক্ষিণ কালীগঞ্জ, বসিরহাটের কাছে, তেঁতুল বোঝাই নৌকো, গাঁয়ে গায়ে তেঁতুল কিনে বেড়ায়। এইবার সামান্য একটু মেঘ করেচে। ঐ পাইকপাড়া গুরু ট্রেনিং স্কুলের বাড়ি দেখা দিয়েচে।এইখানটা দুধারে বড় বড় নলখাগড়ার বন। কচুরিপানায় জমি ভেসে যাচ্ছে, বড় শিমুলগাছ থেকে শিমুলের পাক্‌ড়া ফেটেতুলো উড়চে বাতাসে, জলের ওপরে অনেক দূর পর্যন্ত এক পুরু তুলো জমে গিয়েচে। বাঃ এই শিমুলগাছটা চমৎকারদেখতে হয়েছে। পাকড়া ফেটে সব ডালে তুলো বেরিয়েরয়েচে, একটা শকুনি কি চিল বসে মগডালে। ছবিটা বেশদেখাচ্ছে।

পাইকপাড়ার ঘাটে মেয়েরা কলসি ডুবিয়ে জল নিচ্চে। একজন দাড়িওয়ালা লোক ঘাটের বাঁধারে ছিপে মাছধরচে।

ঐ দূরে বনগাঁয়ের থানার ঘাটের ঝাউগাছের সারি দেখা দিয়েচে। বনগাঁ আর বেশি দূরে নেই—মাঝি বলচে—এখনোজোয়ার লাগেনি তাইরক্ষে বাবু, নইলে বড্ড দেরী হয়ে যেতো।

বাঁদিকে খুব উঁচু পাড়, পাড়ের ওপারে কুলগাছের জঙ্গল। একটু দুকোণা ইটের পাঁজা। খানকতক চালাঘর জেলেদের। কাদের একটা পিপাসার্ত গরু নদীতে নেমে জল খাবার চেষ্টাকরচে, কিন্তু পাড় বড্ড উঁচু হওয়ার জন্যে নামবার চেষ্টা করেও পারচে না।

মেঘ বেশ করেচে। তবে কালবৈশাখী বা ঝোড়ো মেঘনয়। বেশ ছায়া পড়েচে—ছই-এর বাইরে এসে বসেচি। ঐ খয়রামারির শ্মশানঘাট।বনগাঁ দেখা যাবে এই বাঁধটা ফিরলেই।সুপ্রভা, তোমার খবর অনেকদিন দাওনি। এত দেরী করে চিঠি দাও কেন ?আচ্ছা, ভেবে দেখো (উঃ বড্ড জোর হাওয়াউঠেচে সামনের দিক থেকে, বনগাঁর দিক ধুলোয় অন্ধকার হয়েগিয়েচে। ঝড় উঠলো নাকি মাঝি ?নৌকো বড্ড দুলচেডাঙ্গাঘেঁষে চলো। মাঝি বলচে, না বাবু, আজ জোয়ারের হাওয়া, ভয় নেই, ছই-এ বড্ড হাওয়া বাধচে।)

চিঠিখানা শেষ করি। লেখা যাচ্চে না। কি বলছিলুমশোনো, তুমি গিয়েচ এতদিন—মোটে একখানা চিঠি তোমার পেয়েচি। এই কি ঠিক ?ভেবে দেখো এতে আমার মনখারাপ হয় কিনা ?না, আর লেখা যাচ্ছে না সুপ্রভা, চিঠির কাগজউড়ে যাচ্ছে। তুমি চিঠি একটু তাড়াতাড়ি দিয়ো কতবার বলেচি না ?কথা বুঝি গ্রাহ্য হয় না—না ?আমি ভারী চটে যাবো কিন্তু এরকম করলে।

লেখা অসম্ভব। নৌকো সামনের দিকে লাফিয়ে উঠচেহাওয়ায়। বড্ড দুলচে ! ছইয়ে বেধে উল্টে না যায়। ও মাঝি, ডাঙ্গার দিকে নিয়ে যাও না ?আমি সাঁতার জানি, সে জন্যে ভয় না, ম্যাট্রিকের কাগজগুলো ডুববে।

আচ্ছা আসি। তোমার বাবামা এখন কেমন আছেন ?রেবাসেবা কোথায় ?রেবার Roll-টা আমায় পাঠিয়ে দিয়ো না।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা

পুঃ—চিঠিখানা কাল নৌকোতে আসতে আসতে লিখেছিলুম। ঝড়ে নৌকো ডোবেনি, কিছুই হয়নি। সেবাকে নববর্ষের আশীর্বাদ জানিও।

(৫)

বারাকপুর

শনিবার, সকাল

কল্যাণীয়াসু,

সুপ্রভা, এবার তোমায় খুকুদের বকুলগাছের ফুল পাঠানোহয় নি, সেদিন পত্রখানা ডাকে দেওয়ার পর মনে পড়লো।আজ ওবেলা এখান থেকে চলে যাবো, তাই তোমাকে চিঠিটারমধ্যে কিছু বকুলফুল পাঠালুম। এই বকুলগাছটা আমার বড়প্রিয়, আমার বাল্যের দিনগুলির সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল বড়ঘনিষ্ঠ। ছেলেবেলায় যা কিছু খেলাধুলো, উৎসব, মারামারি, বন্ধুদের সাথে গল্পগুজব—সবই ঘটেচে এর তলায়, এখনোবসে লেখাপড়া করি বকুলতলাতেই। আমার মনে হয় এগাছের একটা ব্যক্তিত্ব আছে, এর নিবিড় শাখাপ্রশাখার মধ্যেকি যেন রহস্য জড়ানো, বাল্যে যখন এর ডালে উঠে খেলাকরেচি, তখন মগডালের উঁচুদিকে চেয়ে ঘন ডালপালার ছায়াও অন্ধকারে ঠিক ওই কথাই মনে হোত, এখনো তা মনে হয়।এত বড়, এত প্রাচীন বকুলগাছ এ অঞ্চলে কোথাও নেই—প্রায়দেড় বিঘে জমি জুড়ে আছে। আমি যাবার সময় প্রতি বছরকিছু ফুল নিয়ে যাই, তোমায় কিছু পাঠালাম, দেখো কেমন সুগন্ধ, তবুও তো শুকিয়ে যাবে, যখন তুমি পাবে।

এ সময় আমাদের দেশে বনে জঙ্গলে বনমরচে লতারফুল ফোটে, অমন মিষ্ট সুবাস কম উদ্যানপুষ্পেই আছে।বনঝোপ, মাঠ, নদীতীর এমন আমোদ করে রেখেচে ঐবন্যলতার ফুলের সুগন্ধে। মাঠে, ঝোপের মধ্যে এক'দিন একাবসে থাকতুম, কি বই পড়তুম—মাথার মধ্যে যেন কেমন করেতার গন্ধে। যত বেলা যায়, ছায়া পড়ে, তত সুবাস ঘন হয়, কিঅপূর্ব গন্ধটা, পাগল করে দেয় একেবারে। অজস্র ফুটেচে বনেজঙ্গলে—কিন্তু তা তোমাকে পাঠানো যাবে না। একটা ফুলেতেমন গন্ধ নেই তো, ছোট ছোট, কুচো কুচো ফুল, গন্ধের mass effect ঐ রকম হয়। দু'তিনদিনের বাসি ফুলে গন্ধ থাকবেও না। একটা নমুনা পাঠালাম, ডাল ও পাতা।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬)

শিলং

Snowview Hotel

সোমবার, সকাল

কল্যাণীয়াসু,

কাল সারা পথটি এত কষ্ট করে আসা সবই বৃথা হল।কি করে জানবো যে তুমি এখানে নেই ?কাল সকালে যখন পাণ্ডুঘাটে এসে মোটরে চড়েচি, তখনো মনে হচ্চে এই তোআর কয়েক ঘণ্টা পরেই সুপ্রভার সঙ্গে দেখা হবে—হঠাৎদেখে সেও খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে। সারাটা ট্রেনে কি ছট্‌ফট্ করতে করতেই এসেচি—পাণ্ডু থেকে গৌহাটি, গৌহাটি থেকে শিলং, মোটর যেন আর চলতে চায় না—কতক্ষণে শিলং পৌঁছুবো, কতক্ষণে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা হবে। দূর থেকে যখনশিলং-এর ঘর বাড়ি চোখে পড়লো, তখন থেকে মন এত চঞ্চল হল যে উড়ে যদি যেতে পারতুম তো এখনই সুপ্রভার সঙ্গেদেখা হতো—মোটর অতি Slow moving vehicle—এক জায়গায় এঞ্জিনে জল দেওয়ার জন্যে গাড়িটা দাঁড়ালো, জায়গাটার নাম 'বড় পানি'—আমার অসহ্য মনে হতে লাগলো, কেন তাড়াতাড়ি ছাড়ে না ?কতক্ষণে পৌঁছুবো ?

তারপর শিলং এসে আমার সেই পুরোনো হোটেলেউঠলুম। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কিছু খেয়েই—এত বেলায়ভাত পাওয়া গেল না—অন্য কিছু খেয়েই লাবান রওনাহলাম। প্রতি পদক্ষেপে সে কি অদ্ভুত আনন্দ, এই সেই মাঠটা, এখানে একবার সুপ্রভার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এই সেইলাবানের পথটা—এখানে সেবার হঠাৎ পথে দেখা হয়েছিলওর সঙ্গে—আর মাত্র কয়েক মিনিট। সনৎ কুটিরের কাছে গিয়ে খানিকটা দাঁড়ালুম চুপ করে। বুকের মধ্যে সে কি ভীষণঢিপঢিপ করচে, একটি মেয়ে বাইরে থেকে এসে সনৎ কুটিরেঢুকলো ঠিক যেন তোমার মতো দূর থেকে দেখতে। তার খানিকটা পরে আমিও গেট্ দিয়ে ঢুক্‌লাম। একটি চশমা পরামেয়ে সামনের বারান্দাতে কাগজের হকারকে 'ভারতবর্ষ' না 'প্রবাসী'র দাম দিচ্চে। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বল্লে— সুপ্রভা তো এখানে নেই, দেশে গিয়েচে। তার বোনের বড়অসুখ। না, এখন আসবার কোনো chance নেই, মে মাসেরশেষে সম্ভবত আসবে।

সুপ্রভা, এর পরে আমার যা হল, সে কথা আর লিখে কি হবে ?কি যেন হয়ে গেল মুহূর্তে, পায়ের তলা থেকে মাটি যেনসরে গেল, যন্ত্রচালিতের মতো অন্যমনস্ক মনে হাঁটতে হাঁটতেদেখি পাইন মাউন্ট স্কুলের সামনে দিয়ে যাচ্চি। এই সেই পাইন মাউন্ট স্কুল, সুপ্রভা চিনিয়েছিলে, এদিক ওদিক খানিকটা উদভ্রান্তের মতো ঘুরে রাস্তার ধারেই এক জায়গায় বসলুম।সারা শিলং শহরটা তেতো, বিস্বাদ হয়ে গিয়েচে। যেখানেবসেছিলুম, সেটা কাউন্সিল

হাউসের সিঁড়ি। আমার সামনে দিয়ে খাসিয়া মেয়েরা দলে দলে গির্জা থেকে ফিরচে, তখনসন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টিও পড়ছে। আমার শরীরটা যেন আর আমার নয়, মন ভারীপাথর, পা চলে না, নড়তে ইচ্ছে হয় না, সে যে কি অদ্ভুতঅবস্থা। চারিধারে যা ঘটচে সবই যেন স্বপ্ন। এই সেই শিলং, ঐ মেঘাবৃত শিলং ও পাইন বনগুলো—অথচ সুপ্রভা এখানে নেই ?অন্তরের কথা সব কি বলা যায়, না লেখা যায়। সুপ্রভা, কাল যে ভীষণ দুঃস্বপ্নের মতো সন্ধ্যা ও রাত কেটেচে, অতি বড় শত্রুরও যেন অমন অবস্থা কখনো না হয়। কাউন্সিল হাউসেরসিঁড়িতে বসে ভগবানের কাছে বল্লুম—তুমি সুপ্রভাকে এত কষ্ট দিচ্চ কেন ?এই তার বাড়িতে সেদিন এত অসুখ গেল, আবার তার পরিবারে অসুখ, কি মনের কষ্ট তার, ভগবান এসব দূরকরে দাও।

আমার নিজের কষ্ট কেউ দূর করতে পারবে না, সেআমিই জানি। সত্যি, এত দুঃখ কখনো পাইনি। পথের কষ্টওএবার এই গরমে খুব বেশি হয়েছিল, সব ভুলে যেতাম যদিএকবারটি তোমায় দেখতে পেতাম সুপ্রভা। এই জন্যেইচিঠি দিই নি, ভেবেছিলুম চিঠি দিয়ে আর কি হবে, সে চিঠিদেওয়াটা তত পছন্দ করে না, তার চেয়ে দেখা করবো সেই ভালো। কদিন থেকে কলকাতায় তোমায় দেখবার জন্যে কি মনটাই হয়েছিল—গড়ের মাঠে যেদিন আলো আর বাজিহল, করোনেশনের দিন, এত লোকজনের ভিড়, আমরা গাড়ি করে নীরদবাবু, বেলা, বৌঠাককুরুণ, পশুপতিবাবু, হেমেনরায় সস্ত্রীক, সব একসঙ্গে বেড়াচ্চি, আমি এত লোকের মধ্যেথেকেও যেন একা। আমার কেবলই মনে হচ্চে গত জুবিলিরবাজি পোড়ানোর দিন সুপ্রভা ছিল—আজ সে কোথায় কত দূরে। তখনই ঠিক করলুম সুপ্রভাকে না দেখে থাকতে পারবো না—এ গেল শুক্রবারের কথা। শনিবার স্কুল বন্ধ হল, আমিও আসাম মেলে রওনা হয়েচি, ভেবেছিলুম ১০/১২দিন থাকবো, তার জন্যেও তৈরি হয়েও এসেছিলুম, তোমার সঙ্গে অনেককথা ছিল। কতদিন যে তোমায় দেখিনি—সেই যে ট্রামে উঠবারসময় চলে গেলে !Y.M.C.A.-র মোড়ে—সেই শেষ।

থাক্‌ আমার নিজের কষ্ট। কিন্তু তোমার নিজেরও তো খুব মানসিক কষ্ট ও বিপদ যাচ্চে। তাই ভেবে আমার কষ্ট হয়েচে আরো বেশি। যদি এমন কোনো ইন্দ্রজাল আমার জানাথাকতো, ইচ্ছে হয় তোমার সব দুঃখ ও বিপদ এক নিমেষে ফুঁদিয়ে উড়িয়ে দিতাম। কি করে জানবো কেন ভগবান তোমাকেএত উদ্বেগের মধ্যে রেখেচেন।

শিলং শহর কুইনিনের মতো তেতো হয়ে গিয়েচে।আমি আজ সোমবারই বেলা দেড়টায় মোটরে নেমে যাচ্চি।মঙ্গলবার কলকাতা পৌঁছুবো। সেখানে একটু কাজ সেরেদেশে চলে যাবো তার পরদিনই। চিঠি দেওয়ার যদি কোনোঅসুবিধা না থাকে তবে বারাকপুরের ঠিকানায় পত্র দিয়ো। আরযদি অসুবিধা থাকে তবে থাক, চিঠিপত্রে কি হয়। আমার মনেসব সময় তুমি আছ সুপ্রভা, সেখান থেকে তোমায় কে মুছেফেলবে ?

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—যদি বলো না জানিয়ে এলেন কেন ?খানিকটা যে risk নিচ্চি—এটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু surprise visit দেওয়ার আনন্দের জন্যে সেটা নিতে প্রস্তুত ছিলাম।জীবনে পা গুনে গুনে সব সময় চলে না। খানিকটা risk করতেহয়ই। তবে বেশির ভাগই ভেবেছিলুম এখন তোমাদের ছুটি হয় না, হলে জুন মাসে হয়।

(৭)

গোপালনগর-বারাকপুর

২৪শে আশ্বিন, ১৩৯৯।

কল্যাণীয়াসু,

সুপ্রভা, তোমার পত্রখানা একটু দেরীতে আমার হাতে

এসেচে। আমি কলকাতা থেকে বেরিয়েচি ১৫ই আশ্বিন, শনিবারে; তারপর একটি বন্ধুর বাড়ি পূজার নিমন্ত্রণ সেরেসপ্তমীর দিন দেশে আসি। তোমার পত্র কল্‌কতা থেকে যায়সেখানে, তারপর এখানে এসেচে।

একটা কথা, আমি এমন কি লোক যে তুমি আমার কাছেপত্র লিখতে অত দ্বিধা বোধ করেচ পাছে আমি বিরক্ত হই ?সেদিন তোমাদের হোস্টেলে গিয়ে তোমার সঙ্গে কথাবার্তাবলে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলাম, আমারও সেকথা জানাবার আর সুযোগ হয়নি, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের কাছে গল্প করেচি। সেটাআমাকে জানাবার সুযোগ দেওয়াতে আমি বাস্তবিক কৃতজ্ঞ।আমি কোনো অবস্থাতেই ভুল্‌তে পারিনে যে আমি একজন সামান্য স্কুল মাস্টার। আমাদের দেশে সাহিত্যিক খ্যাতির মূল্যকি ?সেদিন কোথায় যেন দেখ্‌লাম বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণেরকার্ডের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, "রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত মদনমোহনমালব্য, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণেরপরিকল্পিত"-এর সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দেশেমুড়িমিছরির এক দর—International standard of values এখানে খাটে না, সাহিত্যিক খ্যাতির মূল্য এখানে কানাকড়িওনা।

তুমি গ্রামের মেয়ে, পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে লালিত ও বর্ধিতহয়েচ, 'পথের পাঁচালী' এইজন্যে তোমার ভালো লাগাস্বাভাবিক। লেখক বইয়েতে কথার বুনানি ও ঘটনাবিন্যাসেরকৌশলে একটাillusion-এর সৃষ্টি করেন। এ illusion-এর যেখানেফাঁকি, গুণী পাঠকনিজের কল্পনা ভাবুকতাদিয়ে সেটুকুপূরিয়ে দেন—তাই সৃষ্টির সাফল্যের মধ্যে লেখক ও পাঠকউভয়েরই সহযোগিতার স্থান আছে, যে পাঠক এই illusion সৃষ্টি কর্তে যতটা সাহায্য করেন, তাঁর কাছে সেই লেখা ততটাসার্থক, এদিক দিয়ে দেখতে গেলে রস সৃষ্টির সাফল্য একটা relative ব্যাপার। একজনের যা ভালো লেগেচে, অপরেরকাছে হয়তো তার মূল্য কিছুই নয়। কিন্তু তা বলে যার ভালোলেগেচে, তার কাছে ওর pragmatic value কিছু কম্‌বেনা। আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় যে আমার লেখা তোমাদের সামান্য একটুও আনন্দ দিতে পেরেচে।

অনেকদিন পরে গ্রামে এসেচি, বড় ভালো লাগ্‌চে। তাতে এবার আমাদের দেশে শরতের রূপ অতি অপূর্ব।বহুকাল এমন নিখুঁত শরৎ দেশে এসে পাইনি। প্রায়ই এ সময়বাদ্‌লা হয়, ঘষা পয়সার মতো আকাশ, দিনরাত টিপ্ টিপ্‌বৃষ্টি, এই কয়েক বছর দেখে এসেচি। এবার আকাশ একেবারে নিমের্ঘ, সুনীল—এমনকি শরতের সাদা সাদা উড়নশীলখণ্ডমেঘও নেই, কেবল এক-একদিন সন্ধ্যায় নদীর ধারেসূর্যাস্তের আকাশে হীরাকসের নিত সিঁদুরের পাহাড়ের মতোরঙিন মেঘস্তূপ কোথা থেকে এসে জোটে। বেলা যত পড়তে থাকে, গাছপালা লতাপাতা থেকে কেমন একটা সুন্দর গন্ধ ওঠে, এটা অন্য সময় হয় না—হেমন্তের অপরাহ্ন ছাড়া; এই সময়ে বৃষ্টি-বাদ্‌লা হলে লতাপাতার এই অপূর্ব কটুতিক্ত গন্ধটানষ্ট হয়ে যায়, দিন কুড়ি মাত্র এর আয়ু। ওদিকে কার্তিকের শেষেঠাণ্ডা পড়লে আর থাকে না। তোমাদের দেশে উদ্ভিজ্জসংস্থানকেমন জানিনে, কিন্তু আমাদের এখানকার বনের কাছেকোথায় লাগে নিউজিল্যান্ডের ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ?চোখে না দেখ্‌লে বোঝাবার যো নেই যে কলকাতা থেকে পঞ্চাশষাট মাইলের মধ্যে এমন নিবিড় বনভূমি লোকালয়ের প্রান্তেথাকা কিভাবে সম্ভব। এদেশে খুব ছাতিম গাছ, এই সময়ে ফুল ফোটে, জ্যোৎস্নারাতে ফুটন্ত ছাতিম বনের সুগন্ধে পথচলাতেই বা কত আনন্দ !

মোটের ওপর দেশে এসে শরীর ও মনের সম্পূর্ণবিশ্রামলাভ সম্ভব হয়েচে। শহরের কর্মকোলাহলের মধ্যে মনটা থাকে যেন ঘোলাজলের ডোবা, সর্বদাই ব্যস্ততা, সর্বদাই engagement, মন একদণ্ডের জন্যে বিশ্রাম পায় না, থিতুতেপারে না—এখানকার মাঠবনের নিভৃত প্রশান্তি ও অবকাশেরমধ্যে নবজীবন লাভ করে। কল্‌কাতা ছাড়া কোনো ছোট শহরেগেলে মনে হয় এটা কল্‌কাতারই দীনহীন রূপ, টিনের চালায়লেখা আছে 'গ্র্যান্ড হোটেল', হোগ্‌লার মেটে ঘরে সাইনবোর্ড ঝুলছে 'দি ইম্পিরিয়াল ট্রেডিং সিন্ডিকেট' ইত্যাদি—কিন্তু এখানে ধারা সম্পূর্ণ

বিভিন্ন, কল্‌কাতাকে নকল করবার কোনো pretension-ও এদের নেই—তাই contract-টা খুব sharp ও well-defined, ব্যস্ত মস্তিষ্ক একদিনেই সুস্থ হয়ে ওঠে।

আমি আজই কল্‌কাতা যাবো, সেখান থেকে এলাহাবাদযাবো বড় মামার কাছে, কিন্তু সপ্তাহ খানেকের মধ্যেইকল্কাতায় ফিরবো এবং বাকি ছুটিটা সেখানেই কাটাবো।সেই অবসরে তোমার কাগজের জন্যে লিখ্‌বো। আশা করিতোমাদের শারীরিক কুশল। তুমি বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। পত্রের উত্তর দিয়ে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়